বাঁশি ও বারবি

আরমান ট্রেন থেকে নেমে ইষ্টিশন মাস্টারের রুমের দিকে গেল। সেখানে কাউকে দেখা গেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মাটির হাঁটা রাস্তা ধরে রওনা হোল। মাইলখানেক গেলেই তার ভাইয়ের বাসা। আকরাম বয়সে তার পাঁচ বছরের বড়। সে একটু আগেভাগেই বিয়ে শাদীর পাঠ চুকিয়েছে। বাবা মা গত হয়েছে যখন আরমান ইন্টারে পড়ে। ভাই আর ভাবীই এখন তার বাবা মা।

আকরাম ধবলপুর রেল ইষ্টিশনের ইষ্টিশন মাষ্টার। বছর দুয়েক আগে সে এখানে বদলি হয়ে এসেছে। ইষ্টিশনের পাশেই তার কোয়ার্টারের অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। তাই তার স্ত্রী শাহিনা থাকতে রাজি হয়নি। গ্রামে প্রাইমারী স্কুলের কাছাকাছি বাসা ভাড়া নিয়ে এই বছর তাদের মেয়ে চুমকিকে ভর্তি করে দিয়েছে।

আরমান বাড়ির ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ডাক ছাড়ে

চুমকি, চুমকি মামনি কোথায়?

রান্নাঘর থেকে ভাবী মুখ বের করে উত্তর দেয়

চুমকি তো স্কুলে গেছে, আরমান। তুমি কখন এলে?

এই তো কিছুক্ষণ আগে ইষ্টিশনে নেমে ভাইয়ার রুমে কাউকে না পেয়ে তারপর বাড়ির পথে রওনা হলাম।

তোমার ভাই আজ ভোরে পাশের ইষ্টিশনে গেছে। ওখানে নাকি লাইনে কি একটা সমস্যা হয়েছে। যাও, হাত মুখ ধুইয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো আমি তোমার চা নাস্তার জোগাড় করি।

আরমান নাস্তা খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। দুপুরে বাবা মেয়ের ডাকে তার ঘুম ভাঙ্গে। চুমকি বলে,

চাচু, এবার আমার বারবি ডল এনেছ তো?

সে উঠে গিয়ে ব্যাগ থেকে বারবি ডল আর চুড়ি ফিতা বের করে চুমকির হাতে দেয়।

আকরাম জিজ্ঞেস করে

কিরে কয়দিনের ছুটি এবারের? কিছুদিন থাকবি তো?

হাঁ, ভাইয়া সপ্তাহ তিনেক থাকতে পারবো।

তারপর হাতমুখ ধুয়ে দু'ভাইতে খেতে বসে। শাহিনা আরমানের প্লেটে হাঁসের মাংস তুলে দিতে দিতে বলে

চুমকিদের স্কুলের নূতন মিস এবার এম এ পাশ করে গ্রামে ফিরে এসেছে। সময় কাটানোর জন্য চুমকিদের স্কুলে জয়েন করেছে। স্বর্ণার বাবাও অবসর গ্রহণের পর স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস করছে।

আরমান ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করে

ভাবী, এসব কথা তুমি আমাকে বলছো কেন?

চুমকিকে স্কুলে আনা নেওয়ার সময় স্বর্ণার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। খুব চমৎকার মেয়ে। তোমার ভাইয়ারও স্বর্ণাকে খুব পছন্দ। আর চুমকি তো মিস বলতে অজ্ঞান।

আরমান মাথা ঘুরিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাতেই সে মাথা দুলিয়ে নীরবে সমর্থন করে। ভাবী আবার বলে

মেয়েটাকে একদিন আমাদের বাসায় চা খেতে বলবো। তুমি স্বর্ণার সাথে কথা বলে দেখো, তারপর তোমার ভাইয়া বাকিটা বুঝবে।

পরদিন সকালে ভাবীর অনুরোধে সে চুমকিকে স্কুলে নিয়ে যায়। ফিরতি পথে করিডোরে সে এক পলক স্বর্ণাকে দেখে। দুপুরে ছুটি শেষে চুমকিকে নিয়ে ফেরার সময় সে নিশ্চিত হয় চুমকির মুখে 'বাই মিস' শুনে। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবে ভার্সিটিতে পড়ার সময় কাউকে যে তার ভাল লাগেনি তা নয় কিন্তু পরিমিত সাহসের অভাবে তা বলতে পারেনি। তাই স্বর্ণার সাথে চা খেতে খেতে গল্প করার বিষয়টা মাথায় আসলে ভয়ে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

কিছুদিন পরে এক বিকেলে ভাবি তাকে স্বর্ণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রাথমিক আলাপের এক পর্যায়ে ভাবী ওদেরকে একা কিছুটা কথা বলার সুযোগ করে দিতে চা নাস্তা আনার অজুহাতে রান্নাঘরে যায়। আরমান কিভাবে শুরু করবে অথবা কোন প্রসঙ্গে আলাপ করবে ভাবতে ভাবতে স্বর্ণাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করে

আমাদের গ্রামটা কেমন লাগছে?

জ্বি, জ্বি খুব ছিমছাম আর নিরিবিলি গ্রাম। আমি আগেও একবার এসেছিলাম। আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা। ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে। আরমানকে কিছু একটা বলতে হয় এই ভেবে সে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে

পড়াশুনা তো শেষ। এখন কি করবেন ভাবছেন?

পড়াশুনার কি আর শেষ আছে। ইচ্ছে আছে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত কিছু একটা করার। তারপর টুকিটাকি আরও দু'চারটে কথা হয়।

রাতে খাবার টেবিলে ভাবী জিজ্ঞাসা করে

স্বর্ণাকে কেমন লাগলো?

আরমান ভাত খেতে খেতে জবাব দেয়

জ্বি ভাবী ভালোই।

আকরাম ও শাহিনা দুজনে মুখ চাওয়াচায়ি করে হেসে উঠলে সে কিছুটা লজ্জা পায়। পরদিন ভাবী এসে তাকে স্বর্ণার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে মুচকি হেসে চলে যায়।

আরমান ভেবে পায়না ফোন করে প্রথমে কি বলবে অথবা কি ভাবে শুরু করবে। রাতে একবার ফোন বাটনে নম্বরগুলো চেপে পরে আর কল বাটনে ক্লিক করা হয় না। আরমান মনে মনে কাল্পনিক কথা বার্তার একটা ছক তৈরির চেষ্টা করে।

স্বর্ণা কেমন আছেন?

কে বলছেন কোথা থেকে? আমি কি আপনাকে চিনি?

আমি আরমান, ওই যে ঐদিন চা খেতে খেতে কথা হলো।

কোন আরমান? এর কোনও মানে হয়? আপনি আমার নম্বর পেলেন কি ভাবে? আজব তো।

এ পর্যন্ত চিন্তা করে আরমানের গলা বুক শুকিয়ে আসে। সে স্বর্ণাকে ফোন করার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

পরদিন ভাবী জিজ্ঞাসা করলে বলে

আমার দ্বারা ওসব ফোন করা টরা হবে না ভাবী। শাহিনা চোখ পাকিয়ে বলে বিয়ের পাত্রী দেখছি তোমার জন্য আর ফোন করে বেড়াবে তোমার ভাইয়া? তোমার দ্বারা হবে টা কি শুনি?

রাতে সে ভাবে আচ্ছা কথোপকথন গুলো গুছিয়ে লিখে ফেললে কেমন হয়? পরে মনে হয় সে না হয় কি জিজ্ঞাসা করবে তা লিখে ফেললো কিন্তু ওপাশ থেকে স্বর্ণা কি উত্তর দেবে বা জিজ্ঞাসা করবে তা সে জানবে কিভাবে? পরদিন বিকালে ভাবী তার মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে বলল

আরমান, স্বর্ণা ওপাশে লাইনে আছে কথা বল।

সে কিংকর্তব্যবিমুঢ় ভঙ্গিতে মুখ ফসকে বলে ফেললো

স্বর্ণা, কোন স্বর্ণা?

ভাবী মুখে আঙ্গুল দিয়ে তাকে ইশারায় চুপ করতে বলে মুখ টিপে হেসে ফোন হাতে দিয়ে চলে গেল। সে কিছুক্ষণ ফোনটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে সম্বিত ফিরে পেতে কানে নিয়ে কাঁপা কণ্ঠে বললো

হ্যালো

কেমন আছেন?

জ্বি ভালো আছি? আপনি কেমন আছেন?

এইতো স্কুল নিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে। আপনার ছুটি কেমন কাটছে?

কেটে যাচ্ছে এক রকম।

আগামী শুক্রবারে আমাদের গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা বসবে। সময় করে সবাইকে নিয়ে চলে আসেন। ভালো লাগবে। আজ তাহলে রাখছি। লাইনটা কেটে যাওয়ার পরও অনেকক্ষন সে ফোনটা কানে ধরে রাখলো।

ভাবী আর চুমকিকে নিয়ে সে চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় এসেছে। মেলা ঘুরে ঘুরে দেখতে তার কাছে খুব ভালো লাগছে। এর আগে কখনো সে গ্রাম্য মেলা দেখেনি। চুমকি মাটির হাঁড়ি পাতিল, খেলনা, শাড়ী, চুড়ি কিনে ব্যাগ ভর্তি করে ফেলেছে। তারপর একটা বাঁশি কেনার বায়না ধরলে তার মা শক্ত ধমক দেয়। সে মুখ ফুলিয়ে কান্না শুরু করে। ভাবীর ধমক শুনে আরমান তাকে বাঁশি কিনে দেওয়ার সাহস পায়না। স্বর্ণা চুমকির হাত ধরে দোকানে নিয়ে তার পছন্দমতো বাঁশি কিনে দেয়। বাঁশি পেয়ে সে কান্না থামিয়ে মাথার বেণি দুলিয়ে বাজাতে থাকে।

স্বর্ণা ও আরমান দুজনেই বাঁশির আওয়াজ শুনে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। বিষয়টা শাহিনার দৃষ্টি এড়ায় না। সে চুমকিকে নিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে কিছুটা এগিয়ে যায়। স্বর্ণা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে তারপর আবার হাঁটতে থাকে। তারপর নিজের মনেই বলতে থাকে

আমি তখন চুমকির বয়সী। বাবা মায়ের সাথে ইস্টিমারে করে খুলনা থেকে বরিশাল যাচ্ছি। সম্ভবত বরিশাল পৌঁছার কিছুক্ষণ আগে আমি বারবি ডল হাতে কেবিন থেকে বেরিয়ে পাশের রেলিং ধরে খেলা করছিলাম। সেই সময় পাশের কোনও এক কেবিন থেকে সাত আট বছরের একটি ছেলে তার ছোট্ট বাঁশি হাতে বেরিয়ে আসে। সে আমাকে শিখিয়ে দেয় কিভাবে বাঁশি ধরে বাঁজাতে হয়। আমি যেইমাত্র তার বাঁশি হাতে নিয়ে ফুঁ দিয়েছি তখনি কেবিন থেকে মায়ের ডাকের আওয়াজ পাই। আমি তাড়াহুড়ো করে কেবিনে ফিরে যাওয়ার সময় বাঁশিটা ছেলেটাকে ফেরত দিতে ভুলে যাই। তার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বরিশালে নেমে যাই। বাসায় গিয়ে হাতের বাঁশির কথা মনে পড়তেই মার বকা খাবার ভয়ে আমার সারা শরীর হিম হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি করে বাঁশিটা আমার পুতুলের বাক্সে লুকিয়ে ফেলি। বাঁশিটা না বলে নিয়ে আসার জন্য সেই ছেলেবেলা থেকেই এক ধরনের অপরাধ বোধ আমাকে ঘিরে রেখেছে।

তারপর থেকেই আমার যখন খুব মন খারাপ হয় অথবা কোনও কারণে খুব ফুরফুরে মেজাজে থাকি তখন বাঁশিটা বের করে কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে বসে থাকি। অবচেতন মনে আমি সেই বাঁশির মালিককে আজও খুঁজে ফিরি। এতটুকু বলে স্বর্ণার গলা ধরে আসে। সে আর কিছু বলতে পারে না।

এর কিছুদিন পর আরমান ছুটি ফুরিয়ে এলে ঢাকায় চলে আসে। তার কাছেও এতদিন এক অবাক বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। অথচ সে কোনদিনই এভাবে ভাবতে পারেনি। প্রত্যেকের জীবনেই হয়ত কিছু ভাললাগার একান্ত স্মৃতি থাকে যা তাকে দিনের পর দিন কষ্ট দিলেও এই কষ্টই যেন তার বারে বারে পেতে ইচ্ছে করে। সে কেন আগে স্বর্ণাকে তার কষ্টের কথাটা বলতে পারলো না?

মাস তিনেক পরে এক প্রবল বর্ষণ মুখর রাতে চারিদিকে দমকা হাওয়া আর বিদ্যুতের চমকানি। আরমান কাঁপা হাতে তার মোবাইল ফোনটা তুলে নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্বর্ণার নাম্বারে ডায়াল করে বলে আমি আপনার হারিয়ে যাওয়া বাঁশিওয়ালাকে খুঁজে পেয়েছি। আপনি যে বাঁশি নেওয়ার সময় আপনার হাতে থাকা বারবি ডলটি তার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন তা কিন্তু আমাকে বলেননি। সাথে সাথে কাছে কোথাও প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দে বিদ্যুৎ চলে যায় আর ফোনের চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আরমান

ক্লান্ত মনে পাশে রাখা কম্বল টেনে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। জীবনে এই প্রথমবারের মতো নিজেকে তার প্রচণ্ড সাহসী বলে মনে হয়।

নাইম আবদুল্লাহ
২৭/০৪/২০১৩